রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিরিশের কবি ও কবিতা, সংযোগে ও সম্পর্কে

সুমিতা চক্রবর্তী

প্রথমেই 'তিরিশের কবিরা' বাক্যবন্ধটির অর্থ স্পষ্ট করে নেওয়া যাক। যদিও এইভাবে শতাব্দীর দশক বিভাজনকে চিহ্নিত করা হয়ে আসছে দীর্ঘকাল যাবৎ। তবু সৃষ্টিকর্মের ক্ষেত্রে একদল কবিকে 'তিরিশের' বলে উল্লেখ করলে আরও একটু ব্যাখ্যার দায় থাকে। সাধারণত কোনো কবিকে কোনো বিশেষ দশকের বলে উল্লেখ করলে আমরা বোঝাতে চাই যে, সেই দশকের অন্তর্গত বছরগুলির মধ্যেই সেই কবির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর সহ। হয়তো সেই কবি সেই নির্দিষ্ট দশকটির দু-চার বছর আগে থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন; এবং তাঁর কবিতা বহমান থেকেছে পরবর্তী কয়েক দশক ব্যাপ্ত করে—তবুও একটি বিশেষ দশকে তাঁর আবির্ভাব-লগ্নের ঐতিহাসিকতা বোঝাবার জন্যই সেই কবিকে সেই বিশেষ দশকের কবি বলে উল্লেখ করবার রীতি অ-বৈজ্ঞানিক নয়। এর ফলে কবির আত্মপ্রকাশের সময়টিকে নির্দিষ্টভাবে বোঝা যায়—যা একজন স্রষ্টাকে বোঝবার পক্ষে খুবই জরুরি।

বাংলা সাহিত্যে তিরিশের কবি বললে আমরা বিশেষভাবে ছ-জন কবিকে বুঝি—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকেও স্মরণে রাখা যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নামও উল্লেখ করা উচিত। এই কবিদের মধ্যে কেউ কেউ—যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু কবি রূপে পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিলেন তিরিশের আগেই, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। কিন্তু সেই পর্বের কবিতায় তাঁদের বস্তুদৃষ্টি, জীবন-দৃষ্টি এবং শিল্প-প্রকরণ এমন কোনো নিজস্বতা অর্জন করেনি যাতে তাঁদের বলা যায় বাংলা কবিতার স্রোতে কোনো পর্বান্তরের দিশারি। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে তাঁদের কবিতা অর্জন করেছিল এক নতুন ধরনের স্বাতন্ত্র্য, যার ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের স্থান হয়েছে 'আধুনিক' কবিরূপে।

'আধুনিক' শব্দটি নিয়ে আমরা খুব বেশি ব্যাখ্যার মধ্যে এখন যাব না। শব্দটিকে স্পষ্টতই দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এক, প্রচলিত স্রোতের যে-কোনো পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুপরিচিত 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটিতে বলেছিলেন সেই কথাই—নদী যেমন চলতে চলতে বাঁক ফেরে, তেমনই মর্জির বাঁক বদলটাই আধুনিকতা। 'পরিচয়' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এমনই ছিল তাঁর ঘোষণা। রবীন্দ্রনাথের উক্তির সত্যতা আমরা মেনেই নেব। এজন্যই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আধুনিক বলে থাকি, আবার মধুসূদনকেও আধুনিক বলি; রবীন্দ্রনাথকেও বলি এবং জীবনানন্দকেও আধুনিক বলেছি। কালের সাপেক্ষে এঁরা সকলেই আধুনিক। দুই, 'আধুনিক', ইংরেজিতে মডার্ন শব্দটির একটি

বিশেষ অর্থও কিছু প্রচলিত। তা হলো বিংশ শতাব্দীতে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব-ব্যাপ্ত যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের মধ্যে—তার ফলে পূর্ববর্তী বহু ধারণা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ বিধ্বস্ত হয়েছিল অনেকটাই। বিশ্বাসের জায়গায় সংশয়, আদর্শবাদের জায়গায় বাস্তববাদ, মানবসভ্যতার মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দারুণ নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল মানুষের চেতনাকে। বিধির বিধানের বিপক্ষেও মানুষের কণ্ঠে জেগেছিল প্রতিবাদ। এই বিশ শতকীয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী জীবনধারণা এবং শিল্পধারণাকেই বিশেষ অর্থে আধুনিক বলে চিহ্নিত করা হয়। যে তিরিশের কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা আমরা বলতে যাচ্ছি তাঁরা এই দুই অর্থেই ছিলেন আধুনিক।

বিশেষভাবে এই পর্বের কবিতা নিয়ে একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। নাম ছিল 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। এই সংকলনের দুই সম্পাদক—আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—উভয়েই একটি করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং দুজনেই রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতার লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন নিজের নিজের মতো। আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর ভূমিকা ধৃত একটি উক্তি স্মরণীয় হয়ে আছে—"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।" আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর উক্তিতে 'রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত'—এই বাক্যবন্ধটি কেবল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অ-ভারতীয় কবিতার প্রশ্ন উঠছেই না, কিন্তু অন্য ভারতীয় ভাষার কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত ব্যাপক ছিল না যে, সেসব ভাষার কবিতায় আধুনিকতার আন্দোলন বিশেষভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হবার প্রয়াসে কৃতসংকল্প হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 'রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত' হতে সক্ষম ও প্রয়াসী কবিতাই যে আধুনিক কবিতা হয়ে দাঁড়ালো তাতেও সংশয় প্রকাশ করা চলে না।

এই তিরিশের কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল গভীর। তাঁরা আ-শৈশব রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েই বড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই লেখা শুরু করেছিলেন ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তখন তাঁরা কিশোর ও সদ্য তরুণ। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ের 'মেন স্ট্রিম' কবিতার ভাব-বলয় ও ভাষা-ভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা—যা সীমাবদ্ধ অর্থে ছিল 'রবীন্দ্রানুসারী'। সীমাবদ্ধ বলছি এ-কারণেই—রবীন্দ্রপ্রতিভার গভীরতা, বহুস্তরীয়তা এবং অসীমতাকে ধারণ করবার ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই তখন তাঁদের ছিল না। তৃতীয়ত, তিরিশের কালপর্বে, যখন এই কবিরা যুগপ্রভাবে, পাশ্চাত্য সমকালীন কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় এবং স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে অন্য ধরনের কবিতা লিখতে শুরু করলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ বাংলা তথা ভারতীয় কবিতার সমগ্র পরিসরে প্রধান কবিরূপে বিরাজমান। তাঁকে সম্মান না করে, তাঁকে গুরুত্ব না দিয়ে কোনো বাঙালি কবির কলম ধরা সম্ভবই ছিল না।

তিরিশের কবিদের অধিকাংশের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর—সেই ১৯২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্তই। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পারিবারিকসূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এতটাই সম্পর্ক-অন্বিত ছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণে, ১৯২৯-এ সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব বসু বার বার রবীন্দ্র-

সান্নিধ্যে এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনে সপরিবার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অতিথিরূপে। অন্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের নৈকট্য খুব বেশি না থাকলেও ছিল পত্রালাপ। তরুণ কবিরা শ্রদ্ধাভরে কবিতা-সংকলন পাঠিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথকে; অভ্যাসমতো প্রাপ্তি স্বীকারও করতেন রবীন্দ্রনাথ। কোনোমতেই আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক বাংলা কাব্য' নামে আবহমান বাংলা কবিতার যে সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন সেখানে স্থান পেয়েছিলেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। মনে রাখতে হবে এই সংকলন সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথ পঁচাত্তর-ঊর্ধ্ব এবং সহকারীদের দ্বারা কিছু পরিমাণে চালিত। তা সত্ত্বেও এই আধুনিক কবিরা স্থান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই ইচ্ছায়। এই কবিরা তখনও একান্তই তরুণ, কেউই প্রতিষ্ঠিত নন। মনে রাখতে হবে, এই আধুনিক কবিতা ভাব ও ভাষা কোনো দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের একান্ত মনোমতো ছিল না। তা সত্ত্বেও কবিতা-স্রোতের এই বাঁক ফেরার আভাসকে তিনি উপেক্ষা করেননি।

কেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই তিরিশের কবিদের সম্পর্ক? সময় যখন এতটাই বদলে যাচ্ছে, তখন বিভিন্ন প্রজন্মের কবির মধ্যে সাহিত্যের সম্পর্ক, একজন শিল্পীর সঙ্গে আর-একজন শিল্পীর সম্পর্ক ঠিক সেভাবে সরল ও একমুখী হওয়া সম্ভব নয়। সেই সম্পর্কটিকেই আমরা নির্ণয় করবার চেষ্টা করবো এখানে।

এই সম্পর্কের আছে এক সাহিত্যিক দোলাচল; পাশাপাশি, খুব বেশি না হলেও, আছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের এক সেতু। সেই সেতুর বাতাবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে প্রীতি, আর তরুণতর কবিদের দিক থেকে শ্রদ্ধার বিনিময়-পথ। তবু ক্বচিৎ কখনও ব্যক্তিগত ভাবের আদান-প্রদানে ঈষৎ বিপরীত হাওয়ার কম্পন অনুভব করা যায়। তার সাক্ষ্য থেকে গেছে চিঠিপত্রে। আমরা দু-দিক থেকেই বিষয়টিকে দেখবার চেষ্টা করবো।

কবিতায় যে একটা নতুন ধরনের বাঁক আসছে সে-সম্পর্কে বাংলার কবি ও পাঠকেরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রথম থেকেই। যদিও সুপরিকল্পিতভাবে নয়, তবু 'কল্লোল' (১৯২৩-১৯২৯) পত্রিকাকেন্দ্রিক তরুণ কবিরাই এ-বিষয়ে প্রথম একযোগে ভাবতে শুরু করেন। এই কালসীমার মধ্যে ছিল 'কল্লোল' ছাড়াও 'সংহতি' (১৯২৩-১৯২৫), 'কালিকলম' (১৯২৬-১৯৩০), 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯৩০) পত্রিকা। সকলকে নিয়েই এই দশকটি 'কল্লোল-যুগ' নামে অভিহিত হয়—কারো কারো আপত্তি সত্ত্বেও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতো সসম্মানে। কিন্তু 'কল্লোল'-এর কবিতার প্রকৃত আকর্ষণ ছিল মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলামের রবীন্দ্র-'স্বতন্ত্র' সুরের রচনাগুলিই। ইন্দ্রিয়বেদী জীবনস্বাদ; কঠিন ও দৃপ্ত শৌর্যময় মনোভঙ্গি; অ-সজ্জিত বাস্তবের আপাত-কর্কশতা; দুঃখ-দারিদ্র্য সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা; মঙ্গলমুখীন আধ্যাত্মিকতায় সংশয়; উদ্দীপ্ত প্রতিবাদী স্বর; রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রত্যক্ষ উচ্চারণ; চলিত, তদ্ভব, দেশজ, আরবি-ফারসি শব্দাবলির যথেচ্ছ প্রয়োগ—এসবই ছিল পূর্বোক্ত তিন কবির কাব্য-চরিত্র। এবং এসবের কোনোটিই তেমনভাবে ছিল না রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। তবুও যে 'আধুনিক' বিশেষণটি এঁদের কবিতায় ব্যবহৃত হয়নি তার প্রথম কারণ

আধুনিক কবিতার স্বতন্ত্র চরিত্র লক্ষণ সম্পর্কে তখনও সুশৃঙ্খলভাবে কোনো চিন্তাভাবনা শুরু হয়নি। দ্বিতীয়ত, এঁদের কবিতায় জীবনের বাস্তবের ছবি যতই থাক, মানব-সভ্যতার শুভবাদী লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না। ভালো এবং মন্দের বিভাজন-রেখা ছিল দ্বিধাহীন। তৃতীয়ত, ভাষার দিক থেকে এই তিন কবিই ছিলেন প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণ-অনুসারী অন্বয়ের পক্ষপাতী। শব্দে, অন্বয়ে, উপমা-চিত্রকল্পে, প্রসঙ্গ-উল্লেখে খুব বেশি দুরূহতা, অস্পষ্টতা, প্রগাঢ় কোনো সংশয়াভাস নিয়ে আসার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। এই কবিদের ভাষা ছিল এক স্তর বিশিষ্ট; বাচ্যকে ঘিরে জটিল জীবনবোধ ও জটিলতর আধুনিক মননের বাচ্য-অতিরিক্ত ছায়া-বলয় রচনা করতো না তাঁদের ভাষা। উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতার ছবি তাঁদের কাছে প্রায় অকল্পনীয় ছিল। জীবনানন্দের মতো 'বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ' বা 'ডোডোমির অতল ক্রেস্কার' জাতীয় ভাষা নির্মাণও ছিল তাঁদের সাধ্যাতীত।

কিন্তু সেই 'কল্লোল'-এর কাল থেকেই কোনো কোনো কবি সচেতনভাবে ভিন্ন পথগামী হবার কথা ভাবছিলেন। এবং সেই ভিন্ন পথেরই আর-এক নাম হতে পারে রবীন্দ্র-স্বাতন্ত্র্য। কারণ বিশ শতকের তৃতীয় দশকের বাংলা কবিতার ভাব ও রূপ বলতে তখনও প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও তার অনর্গল অনুসরণই বোঝায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল যুগ* গ্রন্থের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক..." 'কল্লোলে'র পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।" একথা ঘোষণা করে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—সেই নবীনতার সাধনার সাহস দিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি বলেছিলেন, "এমনভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই।" রবীন্দ্রনাথকে সম্মুখবর্তী লেখক বলে গ্রহণ করা হবে কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন "রবীন্দ্রনাথও না। তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার।" (*কল্লোল যুগ*, পরিচ্ছেদ-৮)। এরপরে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন— "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লা কুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে।"

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার যে পথচিহ্ন দেখিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার, তাতে অবশ্য আধুনিকতার সর্বায়তনিকতা সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। আধুনিকতার ধারণার প্রধান দুটি দিক—তীব্র সংশয়; জটিলতা ও স্ববিরোধ—তা থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল 'কল্লোল'। প্রথাসিদ্ধ মূল্যবোধ, হৃদয়াবেগ-নির্ভর জীবনচেতনা, রোমান্টিকতার আভাবলয় থেকে নিষ্ক্রান্ত হননি 'কল্লোল'-এর কবি ও কথাশিল্পীরা। তবু 'কল্লোল' পত্রিকাতেই যে প্রথম রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিসীমা থেকে সরে এসে সাহিত্য-রচনা করবার কথা ভাবা হয়েছিল তাতেও কোনো ভুল নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাম খুব বেশি গুরুত্ব পায় না। তার কারণও আছে। মনোধর্ম ও কাব্য-আঙ্গিক কোনোদিক থেকেই প্রতিষ্ঠিত কাব্যলোককে খুব বেশি আঘাত করতে তিনি পারেননি। সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িতদের কথা একটু বেশি বলেছিলেন তিনি। কিন্তু কেবল ওই লক্ষণে আধুনিক মনোভঙ্গির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে না। সে মনোভঙ্গির পরিচয় বস্তুত সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথের কবিতায় আরও আগেই পেতে শুরু করেছিলাম আমরা। তা সত্ত্বেও অচিন্ত্যকুমারের কবিতা-পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় স্মরণযোগ্য :

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র-তীক্ষ্ণ আলো—
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।

এই কথাটিই স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণতর ভাষায় পাঠকের বুকে একেবারে বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম :

পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।

তাহলে রবীন্দ্রনাথ থেকে 'সরে আসা'-টুকুই যদিও কবিতায় আধুনিকতার মৌল লক্ষণ হওয়া উচিত নয়, তবু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঘটনা-চক্রে ব্যাপারটা প্রায় সেইরকমই দাঁড়িয়েছিল। যেহেতু উনিশ শতকের রোমান্টিকতা, মানবতাবাদ, মহতী কল্পনা, মুগ্ধ পার্থিবতা—এক কথায় প্রাক্-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্বের শৈল্পিক মানসিকতার সমস্ত লক্ষণই বাংলার রবীন্দ্রনাথ সত্যিই 'রাতের তারা দিনের রবি'-র মতোই ধারণ করেছিলেন। তবু সূর্য-চন্দ্র ছাড়িয়েও আকাশ পরিব্যাপ্ত। সেখানে কোথাও নীহারিকাপুঞ্জের অস্পষ্টতা, কোথাও ভীষণ উল্কাপাত; কোথাও সপ্ত ঋষির স্মরণেও ঘনীভূত হয় 'সাতটি তারার তিমির'; কখনও আধুনিক কবির হৃদয় মন্থন করে প্রশ্ন জাগে—'খণ্ডাবে কবে অমৃতের অপরাধ/কালপুরুষের কাস্তে।' (*কাস্তে*, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, *সংবর্ত*)।

'কল্লোল' পত্রিকায় মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল তো লিখতেনই; লিখতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু। তবু 'কল্লোল'-এর কবিরা নিজেদের আলাদা করে 'আধুনিক' ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। সেই ভাবনাটিকে প্রধান করে তুললেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'প্রগতি' পত্রিকায়। তরুণ ও মেধাবী ছাত্র বুদ্ধদেবের চোখ ও মন খোলা ছিল সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে। পশ্চিমি রোমান্টিক কবিতার দিক-পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন বোদল্যের। তারপর ফরাসি সিম্বলিস্ট এবং ইংরেজ ইমেজিস্ট কবিরা যথাক্রমে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রারম্ভে নতুনভাবে কবিতার ভাব ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধের সংঘাতে বিপর্যস্ত ইউরোপের ভাঙনের ছবি ও স্বরগ্রাম প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল এলিয়ট-এর কবিতায়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে এই নতুন সাহিত্যের পরিচয় পেয়ে উদ্‌বেলিত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ঢাকায় তাঁর সাহিত্য-চর্চার অন্যান্য সঙ্গী থাকলেও আধুনিক সাহিত্যের যে একটি ভিন্ন চরিত্র গড়ে উঠতে চলেছে সে সম্পর্কে বুদ্ধদেবই ছিলেন সবচেয়ে সচেতন। সেই যুগলক্ষণের মূল সুর সাহিত্যে কীভাবে ধ্বনিত হতে চলেছে তা-ও সবচেয়ে বেশি বুঝেছিলেন বুদ্ধদেব বসুই।

নিজেদের হাতে-লেখা পত্রিকা 'প্রগতি'-কে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত রূপ দিলেন বুদ্ধদেব বসু। দেড় বছরের মতো প্রকাশিত হয়েছিল সেই 'প্রগতি'। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই

নতুন কালের কবিতার রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলেন সেই সদ্য বিশ-অতিক্রান্ত তরুণ বুদ্ধদেব বসু। তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল জীবনানন্দের কবিতা। জীবনানন্দই যে বাংলা সাহিত্যের জটিলতর আধুনিককালের প্রধান কবি হতে যাচ্ছেন তা অনুভব করতে দেরি হয়নি তাঁর।

"জীবনানন্দবাবু বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়।" লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু আশ্বিন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের 'প্রগতি' পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে। —"আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।" (*প্রগতি*, ভাদ্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)—এ-ও লেখা হয়েছিল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের আগেই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সেখানেই স্পষ্ট করে 'আধুনিক' শব্দটির উল্লেখ বোধহয় পেলাম প্রথম—"আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায় : তিনি জীবনানন্দ দাশ।" (*কবিতা*, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)।

'অজ্ঞাতপূর্ব', 'আজকালকার' এবং সবশেষে 'আধুনিক'—এই তিনটি বিশেষণ বুঝিয়ে দেয় যে, নতুন একদল কবি নবীন কাব্যলক্ষণ নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়ে উঠছেন 'আধুনিক' অভিধায়।

কোনো কোনো কবি স্বীকার করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেই কবিতা লিখতে চাইছিলেন তাঁরা। আবার কেউ কেউ পরে বলেছেন এমন কথা যে—নিজের কথাটি ঠিকমতো বলতে পারার বিষয়টিই ছিল তাঁদের কাছে প্রধান। রবীন্দ্রনাথ কোনো সমস্যা ছিলেন না। কিন্তু সে-কথা বললেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যভুবন তাঁদের সামনে প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলই। সমগ্র তিরিশের দশক জুড়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং রবীন্দ্রনাথেরই নব পর্যায়ের কবিতা ছিল তাঁদের সঙ্গী। ফলত, কবিতার বিষয়-চয়ন, দৃষ্টিকোণ, নির্মাণ-রীতি, সর্বোপরি জীবন-ভাবনা—সর্বত্রই রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে কোথায় তাঁদের সহযাত্রা, আর কোথায় তাঁরা চলেছেন ভিন্ন পথে—এমনকী বিপরীত পথে—তার বিচার প্রতি পদেই করেছিলেন তাঁরা নিজেরাও, এবং সমকালের কাব্যরসিকেরা। সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আজ আবারও দেখে নেওয়া যায় সত্যিই রবীন্দ্র-যুগের কাব্য-ভাবনার সঙ্গে ঠিক কতটাই মিল আর অমিল ছিল তিরিশের কালপর্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হওয়া আধুনিক কবিদের। একথাও মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক কবিরা সকলেই একই ব্যক্তি-মানসের অধিকারী ছিলেন না। জীবন-ভাবনার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী আর বিষ্ণু দে-র মধ্যে অনেকই পার্থক্য ছিল। এর মধ্যে থেকেই যতটা সম্ভব আমাদের বুঝে নিতে হবে নতুন যুগের কবিদের নতুন ভাবনার পদক্ষেপ আর পুরোনো ভাবনার অনুসরণের ভিতরকার টানাপোড়েন।

অল্প কথায় কী ভাবে পুনরুচ্চারণ করবো আমরা রবীন্দ্র-জীবনচেতনার স্বরূপ—যা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর অসংখ্য কবিতায় ও গানে!—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।

নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।।

আধ্যাত্মিক প্রশান্তির এত নিবিড় উপলব্ধি, সংশয়লেশহীন এই আস্তিকতা, জীবনের আনন্দ-স্বরূপে এত গভীর আস্থা রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তার তুলনা আধুনিক কবিদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। একটা সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের অবিসংবাদিত গুরু বলেই নয়, মনোধর্মেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রকৃতই আস্তিক্যবাদী। করুণাময় পরমব্রহ্মের প্রতি তাঁর ভক্তি মিথ্যা বা ভান ছিল না। জমিদারি পরিচালনা আর আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে কিনা—এ প্রশ্ন নিরর্থক। সব মানুষই এই বিরোধের মধ্যে বাস করে। যে দেশব্রতী নিজের সব কিছু ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছিলেন তিনিই পরবর্তীকালে দলের মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছেন না বলে ভিন্ন দল গড়েন। যে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে যোগ দিলেন, তিনি সঙ্ঘের মধ্যে তাঁর স্থান কোথাও লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না সেই ভাবনায় বিচলিত হয়ে ওঠেন। এর দ্বারা কিন্তু প্রমাণিত হয় না যে কারো দেশপ্রেম বা সংসার-বিরাগ মিথ্যা ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় পুত্র রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে আ-বাল্য পরম ব্রহ্মের প্রতি যে নিবিড় বিশ্বাসের বাতাবরণের মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন তা শ্বাসপ্রশ্বাসে গ্রহণ করে নিজের জীবনভাবনা গড়ে নিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে বিশ্ব, স্বদেশ ও সমাজের শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর সেই উপলব্ধি কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধ, বিশ্বের ও ভারতের রাষ্ট্রিক আন্দোলন, ফ্যাসিবাদের উত্থান, তিরিশের দশক জুড়ে মানব-সভ্যতায় বিনাশী-শক্তির অবিরত ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর মন ও মনন-কে বিচলিত করেছিল—কিন্তু তা প্রধানত চিন্তা, বুদ্ধি, মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতার স্তরে। চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ও অন্যান্য গদ্য রচনায় তার চিহ্ন থাকলেও গান ও কবিতায় সেই বিপর্যয়চিহ্ন কিন্তু প্রায় অনুপস্থিত। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে—তখনও তিনি তাঁর নতুন লেখা কবিতায় উচ্চারণ করেছেন :

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।।

এই জীবনচেতনা, এই প্রশান্তিবোধ, এই আস্তিক্য, এই চরিতার্থতা আর প্রশান্তি থেকে আধুনিক কবিরা নিঃসংশয়েই সরে এসেছিলেন। এমন নয় যে—আনন্দের, শান্তির বা চরিতার্থবোধের উপলব্ধি কখনও তাঁদের ঘটেনি। জীবনের প্রসন্নতার অনুভব থেকে সর্বদাই দূরে অবস্থিত থাকা কোনো শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আধুনিক কবিদের জীবনবোধের ভিত্তি রচিত হয়নি এই অসংশয় আস্তিক্য-চেতনার শান্তিরক্ষিত ভূমিতে। তাঁদের জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল বাস্তবের পৃথিবীর ধূলিতে। সেখানে ফুল ফোটে, বোমাও ফাটে। কল্যাণধর্ম আর অকল্যাণের শক্তিতে সমভাবী আস্থা রেখেই তাঁরা তাঁদের শিল্পজীবন শুরু করেছিলেন। তার চেয়েও বড়ো কথা—এই কল্যাণ আর অকল্যাণ—উভয় শক্তিরই প্রয়োগ ঘটে মানুষের

দ্বারা। দু-এরই হোতা ও কারক মানুষ—কোনো পরমব্রহ্ম নন। এই অবিচল পার্থিবতা আধুনিক কবিদের সুনির্দিষ্ট মানস-লক্ষণ, যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলে না।

জীবনানন্দের কথা আমাদের মনে পড়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই, কারণ অন্য কবিদের চেয়ে তাঁর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশের তুলনা চলতে পারে বেশি। দুজনেই ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মেছিলেন। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশও ছিলেন বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজের একজন আচার্য। নিজের পরিবারে বিদ্যাচর্চা, বিলাস-বাহুল্যহীন জীবনচর্যা, মানুষের মহত্ত্ব ও কল্যাণধর্মে অবিচলিত আস্থা নিয়েই জীবনানন্দের বাল্য ও কৈশোর জীবনের অনেকখানি কেটেছিল। হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাসও জন্মেছিল তাঁর, যেমন আজও জন্মায় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত সংসারের শিশুর। কিন্তু জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের মতো জোড়াসাঁকোর প্রাসাদে আটকে থাকা জীবনযাপন করেননি। আরও পাঁচটি বালকের সঙ্গে স্কুলে পড়েছিলেন। সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের পথও রুদ্ধ ছিল না। জীবনের স্বাভাবিক কঠোর ও কর্কশ দিকগুলিকে জানতে জানতেই বড়ো হয়ে উঠছিলেন তিনি। সত্য অভিজ্ঞতার সেই অভিঘাত ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় শ্রুত পরম ব্রহ্মের করুণার আশ্বাসবাণীতে সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়ে যেতে পারেনি। তারপর যখন জীবনানন্দ ১৯১৭ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার মেসে ও ছাত্রাবাসে থেকে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেন তখন সেই প্রথম মহাযুদ্ধ-সমকালের কলকাতা, নিম্নবিত্ত নাগরিক পরিবেশের ক্লিন্নতা তাঁর চোখে সম্পূর্ণ খুলে দিল মানব-সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ। যা সত্য বলে জানলেন তা থেকে আর বিচ্যুত হলেন না তিনি। জীবনানন্দের পৃথিবীতে মানুষের মঙ্গলবোধ ও কল্যাণাদর্শ অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু এক কঠিন সংগ্রামরত সংসারে প্রতিনিয়ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংঘাতে মানুষ সেখানে বিপন্ন। কোনো পরম শান্তির প্রত্যাশা সে আর করে না। কোনো পরম শান্তিময়ের ভরসাও সে আর করে না। জীবনের চলা অব্যাহত রাখবার জন্য, পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখবার জন্য বহু আয়াসে মানুষ তার আশাকে বাঁচিয়ে রাখে, শুভ-এষণার শক্তিকে রাখে অ-নির্বাপিত। *বেলা অবেলা কালবেলা* সংকলনের শেষ কবিতা 'হে হৃদয়' জীবনানন্দের অন্তিম পর্যায়ী আশাবাদের দৃষ্টান্তরূপে উদাহৃত হয়। কিন্তু যদি দেখি কবিতাটির শেষ স্তবকের সেই বহুশ্রুত উক্তি :

ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।।

তাহলে মনে হয় না কোনো পরম নিশ্চিন্ত এক আশাবাদী প্রত্যয়ে কবির মন পরিপূর্ণ হয়ে আছে। মনে হয়—কবি এই সত্য অনুধাবন করে আশায় বুক বাঁধার চেষ্টা করছেন যে—অতীতে দেখা গেছে (ইতিহাস খুঁড়লেই) বহু বিপর্যয়ের (দুঃখের খনি) মধ্যেও মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে তা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং মানবসমাজকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে, এটুকুই তাঁর আশা। তার ফলে যে এক পরমসুন্দর মানবসমাজ (মধুময় পৃথিবী) গড়ে

উঠবেই—এমন কোনো বাণী এ-কবিতায় নেই। বরং মানবজীবনের যে-ছবি তিনি ওই কবিতারই পূর্ববর্তী একটি স্তবকে এঁকেছেন সেটি দেখে নেওয়া যেতে পারে :

পর্বতের পথে পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে?
পতঞ্জলি এসে বলে দেবে
প্রভেদ কী যারা শুধু বসে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর-গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যায়?

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আস্তিক্য-বিশ্বাস জারিত প্রশান্তিবোধের এই ভাবনা-কেন্দ্র থেকে সরে আসাই রবীন্দ্রনাথ আর তিরিশের দশকের প্রথম-পর্বিক আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রধানতম পার্থক্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন—'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে'; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন—'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী' আর 'হয়তো ঈশ্বর নেই, স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ'। এই দুই কবি এবং জীবনানন্দের তুলনায় বেশ খানিকটা বেশি প্রত্যয়শীল ছিলেন বিষ্ণু দে। ঐশী শক্তির প্রতি নির্ভরতা নয়, কিন্তু মানব-সৃষ্ট এক শুভ পৃথিবীর আশ্বাস তাঁর মন থেকে প্রায় কখনই মুছে যায়নি। (একেবারে শেষ কয়েক বছরে লেখা কিছু কবিতায় হতাশাগ্রস্ততা লক্ষ করা যায়)। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও বিস্ময়মুগ্ধ রোমান্টিক চেতনায় অনেকখানি নিমগ্ন কবি। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এক ইন্দ্রিয়োত্তীর্ণ পরমতার বোধ প্রথমাবধি বিকীর্ণ ছিল। তাকে প্রায় ঐশী উপলব্ধিও বলা যায়। যদিও ক্রমশই কবি অতীন্দ্রিয় প্রশান্তিবোধের আশ্রয় ছেড়ে মর্ত্য পৃথিবীকেই আলম্বন করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কবির এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও বলা যায়—যেভাবে রবীন্দ্রনাথ মানসযাত্রী হংসের মতো নমস্কার-নিবেদনের পথ ধরে পরমপিতার করুণা আশ্রয়ে প্রশান্ত আত্মসমর্পণ করতে পারতেন —তা সাধ্য ছিল না পরের যুগের কবিদের পক্ষে। বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রধান লক্ষণই হলো দ্বন্দ্বময় প্রগতিশীলতা—সংঘাত ও সংগ্রাম সেখানে অপরিহার্য :

শরশয্যার নক্ষত্রের গানে
বিভীষণ বুঝি দেয় হাতছানি?
কিংবা হয়তো মরাগঙ্গার জলে মদ্যপ পঙ্খলে
বিষাক্ত মাটি ধুয়ে দেবে বানে চরম আত্মদানে?

(*যুযুৎসুর খেদ, অন্বিষ্ট*)

চরম কোনো হতাশা বা ঐকান্তিক বৈনাশিকতায় বিশ্বাস বুদ্ধদেব বসুরও কবিধর্ম ছিল না। আনন্দ, আবেগ, উৎসাহ তাঁর কবিমনের অনেকখানিই পূর্ণ করেছিল। কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব কোনো প্রশান্তির পরিমণ্ডল ও সেই শান্ত স্থৈর্যের উৎস-আশ্রয় কোনো কারুণিক ঈশ্বর তাঁর কল্পনার কেন্দ্রে ছিলেন না কোনোদিন :

আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ,
হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।।

(*বন্দীর বন্দনা*)

এই স্বীকৃতি আছে সেই কবিতাতেই—যেখানে কবিতার ভাষায় বিশ্বস্রষ্টার অমোঘ উপস্থিতিতে কোনো সংশয় প্রকাশ করা হয়নি।

অমিয় চক্রবর্তীর সবচেয়ে পরিচিত কবিতা মনে হয় 'সংগতি'। 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'-এর আস্তিক্যবাদী ঘোষণার সেই কবিতাতেই কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী অশান্তিময় জীবনচিত্রের নির্মম রেখাগুলিকে মুছে যেতে দেননি :

আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা,
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—

আসলে প্রশ্নটা এই নয় যে, ঈশ্বরের নাম কবিতায় করা হলো কি হলো না। প্রশ্নটা এখানে, কল্পনার সেই ঈশ্বরকে—'তবুও শান্তি, তবু আনন্দ' রূপে অনুভব করা হলো কি না। দৈন্যলেশ-উত্তীর্ণ পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি সেই ঈশ্বরের মধ্যে কবিরা দেখেছেন কি না। এরই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যেখানে দ্বিধাশূন্যভাবে বলবেন 'হ্যাঁ'—আধুনিক কবিদের অবধারিত উত্তর হবে—'না'। এর মধ্যেও অন্যান্য আধুনিক কবির সঙ্গে জীবনানন্দের পার্থক্য অনুভব করা যায়।

অপরাপর কবিরা কিন্তু কোনো-না-কোনো সময়ের বিধাতার প্রসন্ন দক্ষিণ-মুখকে স্মরণও করেছেন—অন্তত স্বীকার করেছেন সেই ঐশী শক্তিকে। প্রিয়াকে স্মরণ করে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—'তোমায় আমি রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে'; 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার শেষে প্রেম সম্পর্কের বহু ওঠা-পড়ার অন্তে মিলনের পূর্ণতার উপলব্ধির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সংশয়বাদী সুধীন্দ্রনাথও ঈশ্বর-স্মরণ না করে পারেননি—'বিধির আশিস মুকুটিত করে যুগল মাথা'। বিশ্বকর্মা ঈশ্বরকে 'রুদ্র কামার'-এর রূপকল্পে হৃদয়ে ধারণ করে প্রগাঢ় আবেগ-শিল্পিত এক কবিতা রচনা করেছেন অমিয় চক্রবর্তী :

আমার রুদ্র পরম কামার
ধক্ ধক্ জ্বালালেন, তিনিই জ্বালেন
বস্তুকারাকে। স্বস্তিধারা কে রাখে।
(*রুদ্র কামার, মাটির দেয়াল*)

বিষ্ণু দে-র কবিতায় পার্বতী, পরমেশ্বর বা ক্বচিৎ কৃষ্ণের উল্লেখ অবশ্য পুরাণ-প্রতিমা সৃষ্টির জন্যই; আস্থার অবিচলতা আর প্রাণের বিশ্বাস মানুষের পরেই তিনি রেখেছিলেন, কোনো অঙ্মনসগোচরের উপর নয়। আর প্রেমেন্দ্র মিত্রও বেশ কয়েকবার ভগবানের নাম করলেও (নীলকণ্ঠ শিবসহ) তাঁরও আরাধ্য দেবতা মানুষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবু কেউ কম, কেউ আরও কম হলেও ঈশ্বর ও দেবদেবীর নাম করেছেন তাঁরা। একেবারে না করে পারেননি। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায়, তাঁর কাব্য-কল্পনা-লোকে অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ, রহস্যময়ের স্থান থাকলেও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় নেই। কোনো আশ্রয়-আকাঙ্ক্ষা, কোনো প্রার্থনা, কোনো করুণাময়ের প্রতি আস্থা, কোনো আত্মনিবেদন তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় না। সর্বতো অর্থেই এক নিরীশ্বরবাদী কবি, যিনি এক অ-শান্তিময় পৃথিবীর জীবন-অভিজ্ঞতাকে অন্তর-মজ্জা নিঙড়ে কবিতা করে তুলেছিলেন। যদি বা কখনও শান্তি তাঁকে

স্পর্শ করে গেছে তা ক্বচিৎ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে (মৃত্যুতেও সবসময়ে শান্তি পাননি); আর দু একবার প্রেমের অনুষঙ্গে। কিন্তু সে শান্তিও চিরকালীন নয়, দু-দণ্ডের মাত্র। ওই বিখ্যাত কাব্য পঙ্‌ক্তিটিতে 'শান্তি' শব্দটি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গুরুত্ব বহন করে 'দু-দণ্ড' শব্দটিও।

রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট পার্থক্যের ক্ষেত্র ছিল রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধের ধারণা। কবি তাঁর কল্পনা-শক্তির সাহায্যে এক সুন্দরের রূপ গড়ে তুলবেন —একথা মোটামুটি পরিষ্কার করেই লিখেছিলেন কোলরিজ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সাহিত্য-তত্ত্বের গ্রন্থে (বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া)। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ'। (ভূমিকা, *সাহিত্যের পথে*)। কিন্তু এই 'সুন্দর' অর্থে কি কেবলই প্রথাসিদ্ধ ও প্রীতিপ্রদ, সৌষম্যময় সুন্দরের ভাবনা ছিল তাঁর মনে? তা যে নয়, তা-ও বলেছেন তিনি ওই বাক্যটির পরেই। মঙ্গলকাব্যের ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা না গেলেও সাহিত্যে তাকে সুন্দরই বলতে হয় অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।' শিল্প-সাহিত্যের 'সুন্দর' আর প্রথাসিদ্ধ 'সুন্দর'-এর ধারণার মধ্যে এই প্রভেদের তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন কিন্তু কিছুটা তাঁর নিজস্ব রুচিবোধে, আর কিছুটা দীর্ঘ কাব্য-সংস্কারবশে কাব্য-উপাদানের সৌন্দর্যবিচারে তিনি প্রথাসিদ্ধ পথ পরিহার করতে পারেননি। আবার আপাত-অসুন্দরেরও যে স্থান আছে বিশ্ব-জগতে এবং সেই কারণেই শিল্পেরও জগতে এ সত্য না মেনেও তিনি পারেননি। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রমানসের এই দোলাচলতার চিহ্ন আছে। ময়ূর আর শকুনি, শুয়োর আর হরিণ—সব কিছুই মান্য তারা সত্য বলেই। সত্য বলেই কাব্যেও তারা স্থান পাবে—এই যুক্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই সব কিছুকেই সমান সুন্দর বলে ভাবতে পারেননি। '...ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যটাকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে—এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে।' (*আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে*)। তবু কিন্তু অ্যাপলো, সূর্য, ওক গাছ আর ব্যাঙকে এক পর্যায়ে বসাতে তিনি পারেননি। রবীন্দ্র-কাব্যে অসুন্দরের স্থান আছে একথা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সেই 'কাঁঠালের ভূতি' আর 'মরা বেড়ালের ছানা'; 'নেড়ি কুকুর' আর 'গুবরে পোকা'-র উল্লেখই করা হয় বারবার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'তুচ্ছ' আর 'সামান্য'-র উদাহরণ রূপেই এসবের প্রয়োগ করেছিলেন। যদিও জীবনের প্রেক্ষিতে নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি-র উল্লেখও করেছেন তিনি, কিন্তু এগুলিকে 'সুন্দর'-এর দৃষ্টান্ত কখনই করে তোলেননি।

আমরা জানি রোমান্টিক কবিদের এই 'সুন্দর'-এর ধারণায় খুব বড়ো পরিবর্তন নিয়ে আসেন প্রধানত বোদল্যের ও তাঁর ঠিক পরেই র‍্যাঁবো। যা প্রচলিত ধারণায় কুৎসিত, অসমঞ্জস, উদ্ভট, রুগ্ন—তাকে তীব্র-আকর্ষক করে কবিতায় রূপ দিলেন তাঁরা। ইউরোপীয় কবিতার আধুনিকতা যেমন অনেকখানি ঋণী বোদল্যের-এর কাছে, বাঙালি কবিরাও অনেকখানি তা-ই। কবিতার উপাদান রূপে সুন্দর-অসুন্দরের প্রকারভেদ তাঁদেরও মন থেকে ঘুচে গেল। বিষয় নির্বাচন হয়ে উঠল সর্বত্রচারী ও সর্বস্বগ্রাহী। কিন্তু তবুও বলা যায় 'সুন্দর'

সম্পর্কিত প্রথাসিদ্ধ ধারণাটির পরিবর্তন সব আধুনিক কবির মনেই ঘটল না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র আর অমিয় চক্রবর্তী—এই চারজন কবিই কিন্তু অনেকটা প্রথাসিদ্ধ অর্থেই সুন্দরকে 'সুন্দর' দেখলেন।

'সুন্দর'-ভাবনার প্রধান দুটি আধার হয় নিসর্গ আর মানবশরীর। দুটি ক্ষেত্রেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় সবটাই ঐতিহ্য-অনুসারী সৌন্দর্যচেতনার কবি। নিসর্গকে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই সর্বদা সুন্দর দেখেছেন :

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে।
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে।
শ্যামসন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দন টীকা জ্বলে।

(*নান্দীমুখ, সংবর্ত*)

বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত বর্ণনার এই ধরন সর্বব্যাপ্ত সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। অধিক উদাহরণ বাহুল্য। নারীরূপের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই। সিতাংশুকান্তি, নীলনয়না, স্বর্ণকেশী এক প্রিয়াকেই সারাজীবন প্রেম অর্পণ করে গেছেন তিনি তাঁর কবিতায়। সুন্দরের আরও একটি আধার হল শিল্প-জাত বস্তু। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তার প্রয়োগই কম। তবু যখন আছে তখন তা-ও সুন্দরের প্রথাসিদ্ধ প্রত্যাশার মধ্যেই থাকে। সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র, রেশমের পর্দা,স্বর্ণাভরণ, সুরভিসার, 'শ্রমণশোভন বীজন'—ব্যতিক্রম সামান্যই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় খোলা গলায়, সহজ সুরের ঝঙ্কারে, শান্ত আবেশময় রাবীন্দ্রিক সুন্দরের জগতের বাতাবরণ কিছুটা শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু মূলত তাঁরও সুন্দর-কল্পনার পরিসরটি পরম্পরা-গত, অন্তত বোদল্যের-এর সঙ্গে সাদৃশ্য নেই সেখানে। প্রকৃতির বিপুল বিস্তার-পাহাড়-সমুদ্র-আকাশ-অরণ্য-মরুভূমির রূপ তিনি অনুভব করেছেন, জাফরি কাটা জানালায় প্রিয়ার নয়নে অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে মধুর মিনতি-ও তাঁর কাছে একরকম সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। কখনও আগুন-ছেটানো খুরে উড়ে চলা উদ্দাম অশ্ব, কখনও দূর সমুদ্রের গাঙ্‌চিল, কখনও 'শার্সিতে জল-সারেঙ্ বাজে/পথ আজি নির্জন।। বাদ্‌লা পোকার ফূর্তি নিয়ে/জাপানি লণ্ঠন।'—কিন্তু অ-সুন্দরের কোনো স্পর্শ পাই না এর মধ্যে।

অমিয় চক্রবর্তীর সৌন্দর্যবোধই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনিও পার্থিব সুন্দরের হাত ধরে অরূপ-সুন্দরের অসীম পারাবারে অবলীলায় অবগাহন করে আসেন। অজস্র উদাহরণের একটিই দেওয়া গেল :

ঐ সোনা রোদের আঙুল
কোনো নীল দূর থেকে ছোঁয় মোর চুল;
রাঙা ভোর গোলাপের ডালে
লাল হয়ে উঠেছে সকালে;
মশারি সরিয়ে চেয়ে থাকি,
স্বর্গসুখী বাসনার আঁখি।

(*উদয়ন, দূরযানী*)

নিসর্গ-রূপ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ যে-সুন্দরের ছবি কবিতায় এঁকেছেন তা কখনও প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যশালী নাগরিক সংস্কৃতি থেকে তুলে নেওয়া। 'সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো/মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো' কিংবা 'ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি/দুর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি' ইত্যাদি। অথবা তিনি তুলে ধরেছেন বাংলার শ্যামল ও সজল প্রকৃতির বুকে 'কৃষ্ণকলি' নারীদের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য। নারীর রূপে সাগরপারের স্পর্শ দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। অমিয় চক্রবর্তীও ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা-র প্রাকৃতিকতায় ও সাংস্কৃতিক (নাগরিক ও লোকায়ত) জীবনে মানুষের যে আবয়বিক তথা হার্দিক রূপ ফুটে ওঠে তার বহু মাত্রাকে কবিতায় সৌন্দর্যের আধার রূপে উপস্থিত করেছেন। নিদর্শন তাঁর কবিতায় এত অজস্র যে তার দু-একটির উল্লেখ নিরর্থক। ভেনিস থেকে সাহারা, বামিয়ান থেকে মাদ্রিদ—তাদের রূপময় অবয়ব নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। 'এরোপ্লেন', 'হেলিকপ্টার'-এর সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে যান তিনি; সন্ধ্যার পার্টিতে 'টোমাটোর লাল রস ঝক্‌ঝকে ছোট্টো গেলাসে' দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। সোনালি ফাঁপানো চুলের সরু জুতো পরা আমেরিকান মেয়ে, নীল জিনস পরা শক্ত মেক্সিক্যান যুবা তাঁর চিত্ত হরণ করে। ঠিক এই ধরনের বিচিত্র-উজ্জ্বল সাবয়ব রূপদৃষ্টি আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনুভব করি না। অন্য কোনো বাঙালি কবির ক্ষেত্রেও নয়।

সৌন্দর্যকে যেভাবে অনুভব করেন বিষ্ণু দে তার ভাষা-রূপে আধুনিক কবির অভিব্যক্তির নবীনত্ব আছে কিন্তু মূলগতভাবে সেই ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অভিন্ন। একেই পরম্পরাগত সৌন্দর্য-দৃষ্টি বলা যায়—যা আমরা সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও দেখতে পাই। বোদল্যের-এর মতো অসমঞ্জস, অ-সংগত, যন্ত্রণাময়, কদাকার, কুৎসিতের মধ্যে সৌন্দর্যের আবিষ্কার এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য নয়। 'বন্য দোল' কবিতায় বিষ্ণু দে লেখেন :

> মনে হল যেন দাউ দাউ জ্বলে আগুন
> টিলায় টিলায় ছুটে গেল জোড়া বাঘ;
> প্রাচীন রক্তে কিংশুকে লাল ফাগুন,
> প্রকৃতির সাধ সুন্দরে একি মৃত্যুর অনুরাগ।

বসন্তের রক্তপুষ্প-সমারোহকে রবীন্দ্রনাথও আগুন-উপমায় দেখেছেন কখনও—'নীল দিগন্তে আজ ফুলের আগুন লাগল'—কিন্তু জোড়া বাঘের তীব্র গতির উপমা তাঁর মনে আসত না হয়তো। সুন্দর আর মৃত্যু-অনুরাগের মিলন তাঁর লেখাতেও পাই কিন্তু দৃষ্টিপাতের এই তীক্ষ্ণ তীব্রতায় নয়।

বোদল্যের বলেছিলেন 'সেন্স অভ্ বিউটি' থাকতে পারে 'ডিফর্মিটি অব্ ডিস্‌প্রপোরশনেট'-এর মধ্যেও (এডগার অ্যালান পো-র ছোটোগল্প সংকলনের ভূমিকা, ১৮৫৭)—এই ধারণা ততটা গ্রহণ করতে পারেননি আধুনিক বাঙালি কবিদের সকলে। কিছুটা পেরেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। বোদল্যের-এর কবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ আমাদের জ্ঞাত। তাঁর এক শরীর-চেতনা—শরীরেরই ঘাম-পুঁজ, রক্ত-ক্লেদ-বসা—এই সবের সংবেদনা কিছুটা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় পাই। যদিও পরিণত পর্বের গল্পে-উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য অনেক

বেশি পরিস্ফুট। বুদ্ধদেব বসুর 'ব্যাঙ' কবিতাটি স্মরণ করা যায়। ব্যাঙের শরীর-গঠনকে প্রথাসিদ্ধ অর্থে সুন্দর আমরা বলবো না। কিন্তু বুদ্ধদেব সেই আপাতকদাকার রূপ থেকেই নিষ্কাশন করেছেন শিল্প-সুষমা। বাক্‌শৈলীর দিক থেকে এক অসামান্য কবিতা। তবু বুদ্ধদেব বসু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথাসিদ্ধ সুন্দরের রূপরেখাই এঁকেছেন। নিসর্গের চিত্রে তিনি কোমলের সঙ্গে কঠিন সুর মেলাতে ভালোবাসেন। বস্তুত প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য সেখানেই। 'শান্তিনিকেতনে বর্ষা'-র দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়—"ছুটে এলো পিঙ্গল জন্তুর পাল। উত্তর-পশ্চিমে/দিগন্ত জঙ্গম হল ঘূর্ণিত ধুলোর কুহেলিতে।/ও কী পীত-আরক্ত মত্ততা তোলে আকাশ-কুট্টিমে/কম্পন!..."

বোদল্যের-এর ধারণার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন সম্ভবত জীবনানন্দ—যখন তিনি রোমান্টিক কল্পনালোকে আপাত-অসুন্দরের ছবিকে রহস্য-রোমাঞ্চময় আবেশে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। কোলরিজ্ আমাদের দেখিয়েছিলেন কঙ্কাল-জাহাজ, নাবিক-কণ্ঠলগ্ন মৃত অ্যালব্যাট্রস, নিষ্প্রাণ শবের দাঁড় টানার চিত্র। আতঙ্ক-শিহর-সুন্দর এই কবিতা 'প্রাচীন নাবিকের গাথা'-র উত্তরাধিকার অল্পমাত্রায় হয়তো জীবনানন্দ স্বীকার করেছিলেন তাঁর কোনো কোনো নারী-রূপ-কল্পনায়। সহজ জীবনস্বাস্থ্য নয়, সুন্দরের কল্পমায়া নয়, এই নারীদের রূপে জড়িয়ে আছে নষ্ট, মৃত, পর্যুষিতের স্পর্শ—'সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কংকালের রূপ,/ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, হিম স্তন, হিম রোমকূপ!' (ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল)। এই রূপ সুন্দর নয়, তবু এ রূপের মোহ অস্বীকার করা যায় না। আরও এক নারীর 'কড়ির মতন শাদা' মুখ, হিম হাত, চোখে 'হিজল কাঠের রক্তিম চিতা' দেখেছেন কবি, নারীর সৌন্দর্যের ভিতর অসুখ—তার 'বাসি' আর 'মেকি' চেহারা; 'সোনার পিত্তলমূর্তি' চেহারা বারবার প্রতিভাত হয়েছে জীবনানন্দের বিভিন্ন কবিতায়।

জীবনের যে আশ্চর্য মোহাকর্ষণ আছে, তাকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ও প্রসন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যেই উপলব্ধি করেছেন। জীবনানন্দ তাকে অনুভব করেছেন 'গলিত স্থবির' ব্যাঙের আরও দুটি মুহূর্ত বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায়, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখিরির হাইড্রান্টের জল চেটে নেওয়ার মধ্যেও। বাঘের থাবা আর মাকড়শার নাচের মধ্যেও সুন্দর স্বপ্রকাশ—তা জীবনানন্দের কালে বাংলার কবি-শিল্পীরা তেমন করে ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই ভাবনার আদর্শ ছিল না।

নিসর্গ ব্যতীত মানুষের কল্পনা মুক্তি পায় না। মানুষের সৌন্দর্য-ধারণার প্রধান অবলম্বন প্রকৃতি। যা মানুষের কাছে শুভঙ্কর তাকেই সুন্দর, আর যা ভয় ও বিপদের ধারক তাকে অসুন্দর ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে মানুষ প্রাচীনকাল থেকে। তাই দিনের আলোর নিয়ামক সূর্যকে শুভ আর শ্বাপদ-আক্রমণ সম্ভাবিত, নিরাপত্তাহীন অন্ধকারকে অশুভ বলে গ্রহণ করা অস্বাভাবিক ছিল না। অলৌকিক শক্তিতে আস্থাশীল মানুষ প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্যে ঈশ্বরপ্রসাদ আর প্রকৃতির ভয়ংকরতায় সেই ঈশ্বরেরই ক্রোধ অনুভব করেছে। নিসর্গের সঙ্গে ঐশীবোধের এই পরম মিলন প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ—যার পরিপূর্ণ পরিগ্রহণ রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতায় ও গানে দেখি।— 'মেঘের কলস ভরে ভরে প্রসাদবারি পড়ে ঝরে'। নজরুল আকাশের নীল রঙে ঈশ্বরেরই করুণা দেখেছেন—'আকাশ মুড়েছ মরকতে পাছে

আঁখি হয় রোদে ম্লান'। আধুনিক কবিদেরও কেউ কেউ কখনও কখনও নিসর্গরূপে ঐশী মাহাত্ম্য অনুভব করেছেন, যেমন সুধীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী। হয়তো সম্পূর্ণ আস্তিক্যবোধ থেকেই নয়—তবু নিসর্গ-রূপের প্রসন্নতা ও মহিমাই অভিব্যক্ত তাঁদের কবিতায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র অরণ্য-রূপে অ-কলুষ প্রাণোল্লাস অনুভব করেছেন। বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রকৃতি বহুমাত্রিক সৌন্দর্যের আধার, সেই সঙ্গেই মানবজীবনের দ্বন্দ্ব, গতি, সংঘাত, প্রগতিশীলতার উপমা হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু নিসর্গের শুদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত রূপের নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধি আমরা জীবনানন্দ ছাড়া আর কারোর কবিতাতেই দেখি না। আধুনিকদের ঈষৎ অগ্রজ কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই প্রথম বিষয়টিকে এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবেছিলেন। 'বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কি বা?' —এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। কিন্তু তাঁর উত্তর যথাযথ ছিল না। 'মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা'—এই উত্তরেও একদিকে যেমন আছে রবীন্দ্রকাব্যের বিরোধী নিসর্গ-ভাবনা—অন্যদিকে আছে ভারতীয় মায়াবাদী দর্শনের একটি ধারার ঐতিহ্য-অনুসারী ভাবনার প্রতিধ্বনি। কিন্তু প্রকৃতিকে তার নিজস্ব স্বরূপে দেখেননি যতীন্দ্রনাথ। আধুনিক বাংলা কবিতায় সেই বিজ্ঞান-সচেতন যাথার্থ্যে নিসর্গকে অনুভব করেছিলেন শুধুই জীবনানন্দ। স্পষ্টতই ডারউইন-তত্ত্বের নিরিখে গড়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টিকোণ। বিবর্তন-ধারা, প্রকৃতির প্রাণ-রাজ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অনন্ত সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও কোনো কোনো প্রাণীর বিলোপ—ইত্যাদি তথ্য তাঁর কবিতায় হয়ে উঠেছে উপলব্ধির সত্য তথা জীবনেরই অমোঘ ধর্ম। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র 'পাখিরা'—এই একটিমাত্র কবিতার নিদর্শনেই কবির নিসর্গ-দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য বোঝা যায়। উড়ে চলা এক ঝাঁক পাখির কলধ্বনি শুনেছেন কবি, যেমন রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন বলাকা-পক্ষধ্বনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' বিশ্বের সঞ্চরমান এক গতির দর্শনের প্রতীক। আবদ্ধতা, অনড়তা তারা চায় না। উড়ে চলে যায় 'অন্য কোনোখানে'; ধরণীর প্রতি বিন্দুতে সঞ্চারিত করে দিয়ে যায় দূরের পিপাসা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই কবিতায় শেলি-র স্কাইলার্ক সংক্রান্ত কবিতার মতোই অমর্ত্য অতৃপ্তি রূপায়িত। পৃথিবীর রক্ত-মাংসময় জৈব সুখ-স্বাদের স্বীকৃতি নেই এই কবিতায়। জীবনানন্দের রচনাটিতে সেই শরীরী চেতনাই কবিতা হয়ে উঠেছে। তাঁর পাখিগুলি মেরুপ্রদেশের শীত থেকে বহু লক্ষ মাইল পাহাড়-সমুদ্র অতিক্রম করে উষ্ণতার দেশে উড়ে আসে, কারণ তারা বাঁচতে চায় এবং 'তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়'। প্রাণ-বিজ্ঞানের ও প্রাণী-বিজ্ঞানের এই দ্বন্দ্বময় গতিই এই কবিতার মর্মকথা। জীবনানন্দের অনেক কবিতার মধ্যেই নিসর্গের এই অন্তঃসংঘর্ষ, জৈবকামনা-সর্বস্ব প্রাণোল্লাস এবং নিতান্ত শরীরী অস্তিত্বের সত্যটিকে স্পর্শ করা যায়।

প্রকৃতির অন্য মুখ; তার সুন্দর, মোহময়, মানবচিত্ত-নন্দন রূপটিও জীবনানন্দের কবিতায় পরিব্যাপ্ত। 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন'-এর পাঠক মাত্রেই জানেন তা। কিন্তু সেখানেও জীবনানন্দের বর্ণনীয় উপাদান থাকে সম্পূর্ণ বাস্তব। সেই বাস্তবের পরিসরে সুন্দর-অসুন্দর একই সূত্রে গাঁথা। যেমন আছে কমলা রঙের আকাশ, আশ্চর্য সবুজ ঘাস, শিশির বিন্দুর কোমল উজ্জ্বলতা; তেমনিই আছে শিকারি গাঙচিলের নখবিদ্ধ শালিখ, মৃত্যুসম্ভাবনা-তীক্ষ্ণ তীব্র শীত, কীর্তিনাশা নদী। অতীন্দ্রিয় কোনো আবেগার্ত বিশ্বাস বা ঐশী করুণা-ধারণ-সম্ভাবনা প্রকৃতির মধ্যে জীবনানন্দ প্রায় অনুভবই করেননি।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে পার্থক্যের একটি অতি স্পষ্ট রেখা টানা আছে মৃত্যুবোধের ক্ষেত্রে। যে-কোনো দেশেরই শাস্ত্রে ও পুরোনো সাহিত্যে মৃত্যু হলো সেই পথ, যে-পথে ঈশ্বর নশ্বর মানুষকে কাছে টেনে নেন—তাকে পৌঁছে দেন চিরশান্তির স্বর্গে। রবীন্দ্রকাব্যে আছে এই উপলব্ধির ঐশ্বর্যময় প্রকাশ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যধারার বহু বিবর্তনেও এই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সেই যে রাধার জবানিতে 'ভানুসিংহের পদাবলী'-তে লিখেছিলেন 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম-সমান'—লিখেছিলেন কিশোর বয়সে; মৃত্যুকালে ১৯৪১-এর মে মাসেও লিখলেন :

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।।

(*রূপনারাণের কূলে*)

মৃত্যু যে মহাজীবনেরই অন্তর্গত এক পর্যায়, মৃত্যুতে জীবনের পূর্ণতা—এই উপলব্ধির প্রশান্তি কখনও বিচলিত হয়নি রবীন্দ্রকাব্যে।

আধুনিক কবিদের রচনাতেও মৃত্যু সম্পর্কে কোনো ভীতি বা বিরাগের চিহ্ন পাওয়া যায় না। মানবজীবনে যা অবশ্যম্ভাবী সে সম্পর্কে ভয় নিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয় কারোরই পক্ষে। আর মৃত্যুবিহীন জীবন শেষ পর্যন্ত কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে তা আমাদের দেখিয়েছেন জোনাথান সুইফ্‌ট্ তাঁর গালিভার-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের একটি পর্বে। মৃত্যুকে বিরাগের চোখে দেখাও সম্ভব নয়। কিন্তু মৃত্যুকে কোনো পরমার্থ প্রাপ্তির পথ বলেও মনে করতে পারেননি আধুনিক কবিরা। মৃত্যু তাঁদের কাছে জীবনের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। জীবন-স্বাদ-গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এক নির্দিষ্ট পূর্ণচ্ছেদ। চিরকালীনতা ও অমরত্বের বাণী কখনও কখনও আধুনিক কবিদের রচনায় শ্রুত হয় কিন্তু তা জীবনধারার অমরত্বের সূচক, ব্যক্তি-সম্পর্কিত কোনো ধারণা নয়। অমিয় চক্রবর্তী ও ক্বচিৎ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় এই ভাবটি পাই। সবচেয়ে সুন্দর ও সংহত ভাষণ পাই জীবনানন্দের একটি পঙ্‌ক্তিতে—'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'। 'মানুষ' এখানে ব্যক্তি-মানুষ আর 'মানব' মানবজীবনধারা। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বিষ্ণু দে-র কবিতায় মৃত্যুভাবনার ছায়া প্রায় পড়েইনি। তাঁরা পূর্ণ অর্থে স্বাভাবিক, প্রাণময়, সুস্থ জীবনবোধের কবিতাই লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় মৃত্যু এক অজানা রহস্যলোক রূপে প্রতিভাত হয়েছে কখনও কখনও।

মৃত্যু-প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিতাতেই সর্বাধিক। বিভিন্ন অনুভবের আলোয় মৃত্যুকে দেখেছেন তিনি। তাঁর রচনায় জীবন-অন্তে এক মৃত্যুলোকের কল্পনা বারবার দেখা যায়। কিন্তু স্বর্গ-নরক জাতীয় কোনো প্রসঙ্গ সেখানে আসে না। তাঁর কাছে মৃত্যুলোক এমনই কোনো জীবন-পর্যায়, যেখানে জীবনের বেঁচে থাকার ভারে ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ কিছুকালের জন্য নিশ্চেতন ঘুমে নিজেকে নিমগ্ন করতে পারে। 'অন্ধকার' কবিতাটি মনে করতে পারি। 'ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে' পৌষ-সন্ধ্যায় কবি ঘুমিয়েছিলেন কোনোদিন আর জাগবেন না জেনে। কিন্তু পৃথিবীর ডাকে তাঁকে আবার জাগতে হয়েছে।

মৃত্যুর প্রসঙ্গে জন্মান্তরের কথাটিও আমাদের মনে পড়ে। প্রথমেই স্পষ্ট করে নেওয়া যাক, আমরা বিশ্বাস করি না যে আধুনিক কবিদের কেউই মানুষের পুনর্জন্ম সম্পর্কে

সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখতেন। যেভাবে সাধারণ সংস্কারাবদ্ধ মানুষ পূর্বজন্ম ও পরবর্তী জন্মে কখনও কখনও বিশ্বাস করে থাকেন সে-জাতীয় জন্মান্তরবাদী ছিলেন না তাঁরা। এমনকী রবীন্দ্রনাথকেও তেমন সংস্কারাচ্ছন্ন বলে মনে হয় না। কখনও কখনও তাঁর ভাষায় যে পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ থেকে যায় তাকে আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাসের প্রমাণ নয়, ভাষারই মুদ্রা গণতে পারি। 'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে'—এই উচ্চারণ দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো ধরণীর প্রতি কবির নিবিড় ভালোবাসারই স্বীকৃতি। তেমনই সুধীন্দ্রনাথ যদি বলেন—'সে ভোলে ভুলুক কোটি মন্বন্তর/আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না'—তখন বুঝে নিই এ কেবল প্রেম-অনুভবের তীব্র আন্তরিকতাই জানান দেয়—কোটি কল্পান্তের প্রতি কোনো সত্যিকারের আস্থা নয়। জীবনানন্দের কবিতাতেও জন্মান্তর-কল্পনা কোনো অধ্যাত্মবিশ্বাস সূচিত করে না। পার্থিব জীবনকে পরিপূর্ণভাবে, বহু-স্তরিত মাত্রায় অন্তরে শোষণ করে নেবারই এক বাক্-স্থাপত্য এই ভাষার অবয়ব। প্রায় রাবীন্দ্রিক ভাবনাই বলা যায় জীবনানন্দের এই ভাব-কল্পনাকে। তাঁর মৃত্যুলোকের কল্পনা আসলে মর্ত্যলোকেরই সম্প্রসারিত রূপ। 'পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন/তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল'; সেই দিনের গল্প আর রাতের গল্প নিয়েই সম্পূর্ণ জীবনের গল্প মূর্ততা পায় জীবনানন্দের কবিতায়।

আধুনিক কবিদের ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রসঙ্গেও বলা চলে প্রায় একই কথা। এখানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের একটি গভীর পার্থক্য থাকে। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় আচার ও সংস্কারে অনড় কোনো আস্থা না রাখলেও উপাস্য পরম ব্রহ্মের অস্তিত্বে এক অবিচল নির্ভরতা রেখেছিলেন সারাজীবন। একালের কবিদের চিত্ততলে কোনো অবলম্বন-ঈশ্বর সত্যিই ছিলেন বলে মনে হয় না। বুদ্ধদেব বসুর স্নিগ্ধ-প্রসন্ন উক্তি—'তোমায় আমি রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে'—একান্তই প্রেমের সংলাপ, কোনো অর্থে ভক্তির নয়। একথা বলা হয়েছে আগে। 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় যদিও বারবার ঈশ্বরের নাম করা হয়েছে, তবু 'বিধাতা জানো না তুমি/কী অপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে'—এই ঘোষণা কোনো বিশ্বাসের ঈশ্বরকে নয়, কল্পিত এক কবিতায় ঈশ্বরকে সামনে দাঁড় করিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তির ভাষা। প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে'—স্পষ্টতই এই ভগবান মানুষেরই অন্য নাম। বিষ্ণু দে-র সাম্যবাদের তত্ত্বে ঈশ্বরের স্থান ছিল না। তবু তিনি ভারতীয় পুরাণের দেবদেবী, শিব, পার্বতী, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-র প্রসঙ্গ মাঝে মাঝেই এনেছেন। বিশেষত উমা-মহেশ্বর-এর চিত্রকল্প বারবার এসেছে তাঁর কবিতায়। কিন্তু তা এসেছে চিত্রকল্পেরই প্রয়োজনে। সুন্দরের রূপ, বিশ্বাসের রূপ, সংকট উত্তরিত প্রগতির প্রশান্ত সমুজ্জ্বলতাই তিনি যেন দেখেছেন তপস্বী শিব আর তপস্যারই কঠিন ব্রত অন্তে তাঁর সঙ্গে পার্বতীর মিলনের উপমায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় তুলনামূলকভাবে বিধাতার প্রসঙ্গ কিছু বেশি। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সুধীন্দ্রনাথ-বিষয়ক প্রবন্ধে (ভূমিকা, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, ভারবি) তাঁকে ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণার্ত বলে অনুভব করেছেন। আবার শিবনারায়ণ রায় তাঁকে অভিহিত করেছেন 'অকম্প্র নাস্তিক' বলে ('কবিতা,' *সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা*, ১৯৬০)। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় বিধাতার প্রতি নম্র বিশ্বাসের স্বগতোক্তিও আমরা কখনও কখনও

শুনেছি। আবার কখনও ঈশ্বরবিহীন এক পৃথিবীতে মানুষের সহায়হীনতার কথাই স্পষ্ট খেদোক্তিতে ব্যক্ত করেছেন তিনি। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ-ভাষা কিন্তু বাক্-মুদ্রা নয়, অন্তরেরই দোলাচল। তাঁকে তাই আস্তিক্যবাদী বা নাস্তিক্যবাদী—কোনোটিই না বলে আমরা সংশয়বাদী বলতে চাই। জীবনানন্দ পুরোপুরিই মর্ত্যবাদী ছিলেন। অমর্ত্যলাকের কোনো অধীশ্বরের সঙ্গে কোনো দেওয়া-নেওয়া ছিল না তাঁর মনের। প্রসঙ্গক্রমে, চিত্রকল্প রচনার প্রয়োজনে বা অভিব্যক্তির উপরি-আবরণ দেবার জন্যও ঈশ্বরের নাম তিনি করেননি কখনও। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অবশ্য আমরা মূর্ত ঈশ্বরকে না হলেও এক অমর্ত্য-ভাবনায় কবিকে আস্থা স্থাপন করতে দেখি। তাকে ঐশী ভাবনাও বলা যেতে পারে।

যে-ভাবনাটি চিরকালের কবিতায় প্রায় একইভাবে দেখা যায়—তা হল প্রেম। প্রেম ভাবনা ও নারী-ভাবনাকে সমার্থক বলা চলে না একেবারেই। কিন্তু রবীন্দ্রযুগে বেশ কয়েকজন মহিলা-কবি থাকলেও জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথের কালে নতুন যুগের ভাবনার শরিক মহিলা-কবির দেখা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে হৃদয়ের কুল ছাপানো আবেগোলব্ধিরূপে অনুভব করেছিলেন। প্রেম তাঁর কাছে ছিল আত্মনিবেদনের মতোই। কখনও পুরুষের, কখনও নারীর বাচন ব্যবহার করলেও সর্বক্ষেত্রেই নিজেকে দয়িতের কাছে একান্তভাবে সমর্পণ করে দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল প্রেমের ভাষা। প্রেমের সম্পর্কে এক সংশয়হীন আত্মিক বন্ধনের প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক ও অবিকল্প ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। অবশ্য 'রাহুর প্রেম'-এর মতো ব্যতিক্রমী কবিতা তিনি প্রথম জীবনে একটি লিখে ফেলেছিলেন—'দুঃস্বপনের মতো চিরকাল তোমারে রহিব ঘিরে'; 'কাঁটার মতন দিবসরজনী পায়েতে বিঁধিয়ে রব'; 'রোগের মতন বাঁধিব তোমারে দারুণ আলিঙ্গনে'—কিন্তু প্রেমবোধের এই দহনতীব্রতা অচিরেই প্রশমিত করে ফেলেছিলেন তিনি। 'কড়ি ও কোমল'-এর শরীরী বাসনা-সুন্দর প্রেমের কবিতাও লিখলেন কয়েকটি মাত্র। তারপর নয়নের নীরে বাসনা-বহ্নি নিবিয়ে দিলেন তিনি (নিষ্ফল কামনা), জ্বালাময় চোখ উপড়ে ফেলে দেবার আর্তি জানালেন 'সুরদাসের প্রার্থনা'-য়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা যেন প্রেমের আদর্শের কবিতাই হয়ে দাঁড়াল অনেকটা।—'এ বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী তুমি আছ, আমি আছি'। অথবা রাধা-বিরহেরই রাবীন্দ্রিক রূপায়ণ পেলাম তাঁর কবিতায়। এই বোধের শুদ্ধতম রূপটিতে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা মৌলিকতা এনেছেন—'বিরহ মধুর হল আজি মধু রাতে'—একথা পুরোনো কালের কৃষ্ণ-রাধা বলতে পারেননি। তাঁদের বিরহ ছিল অশ্রুসিক্ত, যন্ত্রণাময়। 'ক্ষণিকা'-র যুগে এসে প্রেমের ক্ষণিকতা স্বীকার করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু সেখানেও অভিজ্ঞতার অচিরত্বে উপলব্ধির চিরত্ব অ-গভীর হতে পারেনি।

প্রেমকে আধুনিক কবিরা তুলনায় অনেকটা নশ্বর দেখেছেন। প্রেমের মাধুর্যের উপলব্ধি থাকলেও একেবারে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো 'জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' জাতীয় উচ্ছ্বাস বর্জন করেছিলেন তাঁরা। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমকে যেন বহির্বিশ্বের আহ্বানে আলোড়িত পুরুষের শৃঙ্খল রূপেই অনুভব করেছেন। —'উত্তরমেরু মোরে ডাকে ভাই দক্ষিণমেরু টানে,/ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে।/গৃহবেষ্টনে বসি/কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা শশী।' তাঁর বাহির-বিশ্বে নারী সঙ্গিনী হতে পারেনি। তুলনায় বিষ্ণু দে

নারীকে কর্মসহচরী এবং ঘরে বাইরে সর্বত্র সঙ্গিনী রূপেই দেখেছেন। প্রেম আর জীবনের আশা-উদ্দীপ্ত, কর্ম-চঞ্চল ব্রত-উদ্‌যাপনের মধ্যে কোনো অন্তরায় স্বীকার করেননি। নারী-পুরুষ সম্পর্ককে নতুনভাবে দেখবার দিক থেকে তিরিশের কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-কেই প্রকৃত অর্থে আধুনিক বলা চলে। বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কবিতায় একদিকে ক্ষণস্থায়িত্ব, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা—দুইই স্পষ্ট ব্যক্ত। আবার একধরনের নিবিড়তাও আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দার্শনিকতা ও আস্তিকতার বোধের সঙ্গে প্রেমভাবনাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—তেমন দেখা যায় না কোনো আধুনিক কবির লেখাতেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমের কবিতা সবচেয়ে বেশি সংরক্ত। সে সংরাগে ব্যক্তিমনের তাপ ও সজলতা খুবই অনুভববেদ্য। আবার অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রেমের ভাবনা খুব বেশি নৈর্ব্যক্তিক। প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা ঠিক বলা যায় না সেগুলিকে। তবে কবির আত্মমননের আকুতির প্রত্যাশা পাঠক যদি না করেন তাহলে সেই প্রেমরূপচিত্রগুলি পাঠকের ভালো লাগবে। একটি দৃষ্টান্ত—

ভরা চোখে চেয়ে বলে ছেলে 'রিনি—
কী আশ্চর্য!'
... ...
ভরা চোখে চেয়ে বলে মেয়ে 'তুমি—
কী আশ্চর্য
একটি কাহিনি।

অমিয় চক্রবর্তীর কোনে কোনো বিরহ-কবিতায় লাগে অনির্বচনীয় প্রগাঢ়তার সুর। চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথের মতো মধুরতা বহাতে পারেননি তিনি বিরহের খাতে। তাঁর কবিতার বিরহে শূন্যতাই শেষ কথা।

প্রেমের ক্ষণ-অস্তিত্বের বিষাদ ঘনতর হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের কবিতায়। সব প্রেমই তাঁর কাছে বিরহ-বিষাদ-ক্লান্ত। বনলতা সেনের মতো শ্রাবস্তী, বিদিশা ছেঁচে, নিসর্গ-সজীবতা জমিয়ে তুলে গড়ে নেওয়া কল্পনারীও তাঁকে শান্তি দিতে পেরেছিল মাত্র দু-দণ্ডেরই জন্য। প্রেম অবসিত হয়ে যাওয়ার আবহই তাঁর কবিতায় প্রেমের অনুভূতিকে ঘিরে থাকে। সেখানে নারী তার সঙ্গীকে বলে—'প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা ফুরত না যদি আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—' এই কথা বলবার পর 'ম্রিয়মান আঁচলের সর্বস্বতা' দিয়ে মুখ ঢেকে নেওয়া সেই নারী আমাদের হৃদয়ের অতলে বিঁধে যায়। এমনিভাবেই ক্ষণিকতা, অবিশ্বাস, দ্বিচারিতা, ঈর্ষা, আর অবসানের বোধ নিয়ে আধুনিক কবিদের প্রেম-ভাবনা রাবীন্দ্রিক যুগের প্রেমের বোধ থেকে বেশ কিছুট সরে আসে। যদিও সেই সঙ্গেই সেই প্রেম বাস্তবতা পায় বেশি, পায় বিশ্বাসযোগ্য পরিণতি।

আধুনিক কবিদের নারী-ভাবনায় বৈচিত্র্য এসেছে কবিভেদে। রবীন্দ্রকাব্যে নারী মূলত পুরুষের ভালোবাসার ধন। পুরুষের শান্তি ও আশ্রয়। তার নর্মসহচরী। সে উর্বশী, সে লক্ষ্মী, সে সবলাও কখনও; কিন্তু সে বিদ্রোহিনী নয়, বিমুখ-বিরূপ হয় না কখনও। কলুষ তাকে কখনও স্পর্শ করে না। সে আত্ম-প্রতিষ্ঠ, স্বাধীন নয়। সবল হলেও সে বীরহস্তের

বরমাল্যের জন্য অপেক্ষমান। প্রেমেন্দ্র মিত্র আর বুদ্ধদেব বসুও নারীকে পুরুষের ভালোবাসার অধীনেই রেখেছেন। বিষ্ণু দে নারীকে প্রকৃত অর্থে নর্মে ও কর্মে সহচরী রূপে দেখেছেন, সে-কথাও আগে বলেছি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নারী রূপসী নাগরিকা। ব্যক্তিত্বময়ী, আত্মপ্রতিষ্ঠও কখনও। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটি সেই প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের পরিসরেই থেকে যায়। জীবনানন্দ নারীকে পুরুষের আকর্ষণ-বৃত্তের কেন্দ্রেই রেখেছেন, কিন্তু নারী সম্পর্কে তাঁর কিছু সংশয়ও ছিল। নারীর মোহাকর্ষণ, রহস্যময়তা; নারীর মননসূক্ষ্মতার অভাবের দিকের উল্লেখ কখনও কখনও আছে তাঁর কবিতায়। 'সোনার পিত্তলমূর্তি' নারীর উল্লেখও কেবল তাঁর কবিতাতেই পাই। কিন্তু নারীকে ঠিক পুরুষের সমব্যক্তিত্বে দাঁড় করাতে পারেননি জীবনানন্দ। অবশ্য সেই কালে কেউই পারেননি তা। রবীন্দ্রযুগের মহিলা কবিরাও নারীকে ওই একই ভূমিকায় দেখেছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন। নারী পুরুষের জননী, জায়া, কন্যা; তার আশ্রয় অথবা তার কাছে সমর্পিত। আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী নারী ভাবনার ক্ষেত্রে কিছুটা আলাদা। জীবনের অধিকাংশ সময় পশ্চিমের দেশে কাটাবার ফলে কর্মজগতে ও বহির্বিশ্বে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা মেয়েদের তিনি দেখেছিলেন, তাই তাঁর কবিতায় মেয়েরা অনেক সময়েই মানুষ হিসেবেই আসে—মেয়েমানুষ হিসেবে নয়। জীবনচঞ্চল বিদেশিনী তরুণীদের তিনি প্রীতি-প্রসন্ন চোখে দেখেছেন তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের টানেই—'উজল কপাল, ডাগর দু-চোখ, খোলা হাসি/—আমেরিকান মেয়ে।'

চলে আসা যাক অন্য একটি ভাবনায়। শিল্প ও সাহিত্য সমাজ ও ইতিহাসের প্রতিচ্ছায়াকে বিম্বিত করবে—একথা আজ আমাদের কাছে অবধারিত সত্য বলে মনে হয়। আমরা এ-ও আজ স্বীকার করি যে, সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত একটি যুগের শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণ, বিশিষ্টতা এবং সময়ে সময়ে গড়নও বেশ খানিকটা নির্দেশ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শিল্পের এই সমকালীনতার দাবি ও অবশ্যম্ভাবিতা কোনোটিকেই মন থেকে মানতে পারেননি। 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' (*সাহিত্যের স্বরূপ*) নামের প্রবন্ধে একাধিকবার একথা তিনি বলেছেন। —"সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত; বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যসৃষ্টির কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য মনে হয়।" রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি- মানসে আত্মার আনন্দ থেকেই শিল্প-সাহিত্যের উৎসারণ, আত্মোপলব্ধির আস্বাদনই শিল্প- সাহিত্য রচনা ও আস্বাদনের মৌল প্রেরণা। সাহিত্যে সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-সমকালীন ঘটনাবলির পরিগ্রহণ তাঁর কাছে অনেক সময়েই অসমর্থনীয় ছিল—নিজের বিভিন্ন প্রবন্ধে একথা তিনি বলেছেন অনেকবারই। কিন্তু সম্পূর্ণত একক কোনো সৃষ্টিকর্তা মানুষের পৃথিবীতে থাকা সম্ভব নয় বলেই রবীন্দ্রনাথেরও লেখায় তাঁর যুগের ও সমাজের ছবি সুগভীরভাবে মুদ্রিত হতে দেখি। সমকাল-উদাসীন কোনো শিল্পর পক্ষে 'চোখের বালি' বা 'গোরা' রচনা করা সম্ভবই ছিল না—তা বলা বাহুল্য। তবে সমাজ-সংকটকে প্রত্যক্ষত প্রধান করে তুলে কবিতায় তাকে অন্তর্গত করার কাজ রবীন্দ্রনাথের মনোমতো ছিল না—এই অভিমত ভ্রান্ত নয়।

আধুনিক কবিরা কিন্তু যে অস্থির ও বিপন্ন সময়ের বুক চিরে জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিলেন সেকালে—সময় ও সমাজ-উদাসীনতা একেবারেই সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতেই তাঁদের কিশোর-মনের আবরণ উন্মোচিত হয়েছিল প্রথম। তারপর রুশ-বিপ্লব, ফ্যাসিবাদের উত্থান, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় মঞ্চে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধতা, স্পেনের যুদ্ধ, জাপানের হাতে চিনের পরাজয়—সেই সঙ্গেই ভারতের প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার আন্দোলন, প্রগতি-আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর—তারপর বিশ্বব্যাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—যেখানে শান্তিও এসেছিল পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের হাত ধরে—এই সময়ের চাপ অঙ্গীকার না করে কোনো উপায় ছিল না তাঁদের। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট উক্তিতে বলেছিলেন—'পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে'। ঠিক এভাবেই হয়তো ভাবেননি আধুনিক কবিরা। কিন্তু যুগের প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিকতাকে বর্জন করবার কথাও তাঁদের মনে হয়নি। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় উত্তপ্ত, বিলোড়িত ও বিপন্ন চল্লিশের কালপর্ব কীভাবে স্থান পেয়েছে তা পাঠক মাত্রেই জানেন। '১৯৪৬-৪৭' (*জীবনানন্দ*) কিংবা '১৯৪৫' (*সুধীন্দ্রনাথ*)—কবিতার এমন নাম দিতে কুণ্ঠিত হননি কবিরা। বিশেষ করে চল্লিশের ঘটনাবলি তাদের প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিকতা নিয়েই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কবিতায় উপস্থিত হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীতেই আধুনিক কবিতার অন্যতম লক্ষণ এটি। তাই হিটলার-মুসোলিনি-লেনিন-ট্রটস্কি-র নাম যেমন পাবো সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়; লণ্ডন, ক্রেমলিন, ভার্সাই, লোকার্নো, এমনকী ইউ এন ও-র উল্লেখ পাবো জীবনান্দের কবিতায়। বিষ্ণু দে 'মৌ ভোগ' নামের কবিতা লিখে কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করেছেন। '২২ জুন ১৯৪১' নামের কবিতা লিখে স্মরণ করেছেন বিশ্ব-ইতিহাসের এক সংকট-সন্ধিক্ষণকে। এই তিনজন কবি ছাড়া অন্য আধুনিক কবিদের লেখায় অবশ্য ইতিহাস চেতনার বিস্তার থাকলেও ব্যাপ্তি তুলনায় কম।

ইতিহাস-চেতনা বলতে কেবলই ঘটনার বিবরণ বোঝায় না। মানব-জীবনধারার দ্বন্দ্বময় বিবর্তনের অভিজ্ঞানকে চিত্তে ধারণ করে কবি যখন কবিতা লেখেন, তখনই বলা যায় প্রকৃত ইতিহাসবোধ সঞ্চারিত হয়েছে সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—রাত পোহালে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল। এই ঔপনিবেশিক ইতিহাসচেতনার প্রকাশ ঘটেছে কমবেশি প্রায় সব আধুনিক কবির লেখার মধ্যেই। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কবিতায় অনুপম তার শিল্পরূপ। চল্লিশের কবিরা এই বোধটিকেই কবিতার অন্তঃচরিত্র করে নিয়েছিলেন। এই ইতিহাসবোধ ব্যতীত রবীন্দ্র-উত্তরকালের কবিদের কবিতা রচনা করবার অন্য উপায় ছিল না।

যদি কবিতার প্রাকরণিকতার প্রসঙ্গে যেতে চাই, তাহলে প্রয়োজন হবে বৃহত্তর এক ভিন্ন প্রবন্ধের পরিসর। এখানে কেবল সংক্ষেপে জানানো যাক এইটুকু—যে-কোনো শব্দ, যে-কোনো অভিব্যক্তি, বাক্যের যে-কোনো গড়ন অকাতরে ব্যবহার করতেন আধুনিক কবিরা, যদি তা তাঁদের কাছে ভাব প্রকাশের উপযোগী বলে গণ্য হতো। এ ব্যাপারে শ্লীল-অশ্লীল, দেশি-বিদেশির কোনো ভেদ তাঁরা নীতিগতভাবে মানতেন না। উপমা-চিত্রকল্পের প্রয়োগে অচিন্তিতপূর্ব নবীনত্ব আর যে-কোনো ছন্দ, গদ্যরীতি, যে-কোনো স্তবক-বন্ধনের নিদর্শন তাঁরা কবিতার আঙ্গিকরূপে ব্যবহারে স্বীকৃত ছিলেন। এই নির্বন্ধন স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ ততটা সমর্থনও করতে পারেননি এই

যথেচ্ছতা। কিন্তু এই যথেচ্ছতাকে যথার্থ কবিতা করে তুলতে পারার মধ্যেই আধুনিক কবিদের প্রাকরণিক সাফল্য। তা নিঃসংশয়ে আজ বলা যায়।

আধুনিক কবিতায় পাশ্চাত্য কবিতার ভাব ও ভাষার সাঙ্গীকরণ নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠে। এ পরিগ্রহণ একান্তই সত্য ছিল। কখনও কখনও তা প্রভাবের মতোই দেখায়। অন্য শব্দের আড়াল না রেখে তাকে প্রভাবই বলা যাক। আধুনিক বাঙালি কবিরা এই পরিগ্রহণের ছাপ তাঁদের কবিতায় খুব সোজাসুজিই রেখেছেন। এই রীতি ও মনোভঙ্গিও রবীন্দ্রযুগের নয়। কিন্তু একটি কথা স্বীকার করা প্রয়োজন—আধুনিকতার এই মনোভঙ্গিটি কোনো দেশে সীমাবদ্ধ নয়। একালের মনস্বী মানুষের উপলব্ধির সমগ্র জগৎটিই অন্তর্দেশীয়, আন্তর্জাতিক। বিদেশের কবিদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় বলে বাংলার কবিদের মনের সত্য ছবি যে তা নয়—একথা ভাবার কোনো কারণ নেই।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রবল প্রতিভার এক কবির পরেও তিরিশের কবিরা নিজেদের কেবল বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাই করেননি, রবীন্দ্র-কবিতার রীতিকে বদলে দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা। এত বড়ো একটি সাফল্য সম্ভব হয়েছিল দুটি কারণে। প্রথমত, উনিশ শতক থেকে বিশের দশকে আসতে আসতে মানুষের জীবনাদর্শে প্রকৃতই একটি পরিবর্তন ঘটেছিল। শান্তি থেকে অশান্তি, স্থিরতা থেকে অ-স্থিরতার স্বীকৃতি হয়ে উঠেছিল সর্বব্যাপ্ত। নতুন জীবনভাবনা নতুন কাব্যভাবনার জন্ম দেয়। আধুনিক কবিরা সততার সঙ্গে এই নবীনতাকে বরণ করেছিলেন। পুরোনো ধারার নিরাপদ খাতে নিজেদের বেঁধে রাখেননি। সেজন্য কবিতা রচনার প্রথম যুগে পাঠকের আঘাত ও অবহেলাও সহ্য করেছিলেন তাঁরা। দ্বিতীয় কারণ সংক্ষেপে এই—কোনো কিছুই অনড় ও অপরিবর্তিত থাকে না কোনোদিন। 'হে নূতন দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'—এই নূতনের পথ রোধ করবে কে? এই পঙ্‌ক্তির স্রষ্টাই কি তা পারেন?

শেষ করব সমর সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা সমর সেনের যে চারটি চিঠি পাওয়া গেছে তাতে বয়সে অনেক ছোটো সমর সেনের নিপাট শ্রদ্ধারই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথও সমর সেনের প্রতি স্নেহের সুরেই কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা অনুভব করি সে-কথাটি আধুনিক কবিতার নবীন উন্মেষের প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার ঈষৎ ব্যথিত উচ্চারণ :

> তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে সে আমার অপরিচিত,...। আমাদের রসসম্ভোগের অভ্যাস তোমাদের এযুগের নয় ক্ষুণ্ণ মনে এই কথা কবুল করে তোমাকে আশীর্বাদ জানাই। (১৫ মার্চ, ১৯৪০)

রবীন্দ্রনাথ সেদিন হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আজ আমরা জানি সংস্কৃতির অভিযাত্রায় পরিবর্তন ও পরম্পরা—দুইই অবিচ্ছিন্ন। আজও আমাদের সকল খেলাতেই তাঁরই খেলার আমন্ত্রণ। কিন্তু সে-খেলা পুরোনো খেলা নয়।